উপসংহার

।। উপসংহার ।।

ভাণসাহিত্যের সার্বিকমূল্যায়ন বা সমীক্ষাত্মক বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় সম্‌পূর্বক ঈক্ষ্ ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় করে সমীক্ষা পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ উত্তম রূপে দর্শন এবং তার মাধ্যমে সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন। পণ্ডিতগণ 'সমীক্ষা' শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন — যেমন, সৈদ্ধান্তিক সমীক্ষা বা শাস্ত্রীয় সমীক্ষা। আবার কলাত্মক সমীক্ষা কথাটিরও প্রচলন আছে যেখানে কোন গ্রন্থের রচনা-কৌশল, ভাষা, শৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মনঃসমীক্ষণ কথাটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে ভাণসাহিত্যের সার্বিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা যুগের ধারা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এপ্রসঙ্গে সংস্কৃতে বিয়োগান্ত রূপকের অভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় দর্শন অনুসারে ইহজগতে পরাজয়ই সব নয়। পারলৌকিক সত্তারও একটা গুরুত্ব আছে। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা অবিনশ্বর। এই দৃষ্টিতে সংস্কৃত শুদ্ধ বিয়োগান্তক রূপক উপলব্ধ হয় না। কিন্তু যুগের মনোভাবও সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আচার্যদের এই মনোভাব পোষণে বাধ্য করেছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন হাস্যরসের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের রচনা পাওয়া যায় না। সংস্কৃতে একাঙ্ক ভাণের শাস্ত্রীয় লক্ষণ দেখলেও মনে হয় যে হাস্যরসাত্মক রচনা প্রণয়নের সময় ঔচিত্য-অনৌচিত্যের দিকে খেয়াল রাখার বিধান ছিল। কিন্তু লেখকগণ সবসময়ে এই বিধান মেনে চলতে পারেন নি।

লৌকিক জীবনের আহ্লাদ-বিষাদ, রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের দর্শন ভাণসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে। আকারে ছোট হওয়ার কারণে পূর্ণ নাটকের মত ভাণে নাটকের সব তত্ত্বের উপস্থিতি অত আবশ্যক নয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকের মনোরঞ্জনের জন্য ভাণে বিভিন্ন ধরণের উক্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে শৃঙ্গারের যে সরস বর্ণনা কাব্যময়ী শৈলীতে উপলব্ধ হত, বর্তমানে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে তা দর্শকের সামনে প্রদর্শিত হয়। বাস্তব জগতে যে সমস্ত ঘটনা দেখে বা শুনে আমরা আনন্দ লাভ করি চোখের সামনে সেই ধরণের ঘটনার নাট্যরূপ দেখে আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করি। সংস্কৃত সাহিত্যে এই সুকুমার দিকগুলিই অধিক প্রতিফলিত হয়েছে।

ভাণসাহিত্যে এই তথাকথিত সামাজিক মহত্ত্বের দিকগুলির পরিবর্তে আধুনিক যুগের মতো সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। এর ভাষা গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এবং ভাষা অত্যন্ত গতিশীল; অহেতুক সারল্য তাকে বেশি চটুল করে তোলে নি। ভাণসাহিত্যের লেখকদের উদ্দেশ্য সমকালীন সমাজের জীবন্ত চিত্র তুল ধরা এবং ব্যঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা। ভাণগুলি পাঠ করলে দেখা যায় রাজা, রাজকুমার, ব্রাহ্মণ, বড় বড় সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কবি থেকে আরম্ভ করে ব্যাকরণাচার্য, এমন কি বৌদ্ধ ভিক্ষু পর্যন্ত গণিকাপল্লীতে গমন করতে কোন সংকোচবোধ করে না। বেশ্যা এবং তাদের মায়েদের দ্বারা কামী ব্যক্তিকে দোহন করে সর্বস্বান্ত করার বর্ণনা ও কামুকদের সঙ্গে গণিকাদের মান, লীলা, হাব-ভাব, বিচিত্র ছলাকলার বর্ণনা ভাণগুলিতে পাওয়া যায়। ফলে গুরুগম্ভীর ভাষার পরিবর্তে এখানে কথোপকথনের উপযোগী সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাক্‌চাতুর্যের মাধ্যমে স্থানে স্থানে ভাষাকে মজাদার করে তোলার চেষ্টাও করা হয়েছে। যেমন খুব মোটা লোকের হাঁটাকে বড় জালা গড়িয়ে আসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাণের পাত্রপাত্রী নিম্নস্তরের হওয়ায় অনেকাংশে অশ্লীল শব্দাবলী প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিজস্বভঙ্গীতে বক্রোক্তির মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টিতে এর সাহিত্যিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা মনে করা উচিত হবে না যে ভাণসাহিত্যের ভাষা সর্বত্রই অত্যন্ত লঘু ও চপলতাপূর্ণ। পদ্মপ্রাভৃতকে কন্দুকক্রীড়ারতা প্রিয়ঙ্গুযষ্টিকার সজীব বর্ণনা আমাদের বাণ ও দণ্ডীর বর্ণনাকে স্মরণ করায়। অনুরূপভাবে ধূর্তবিটসংবাদে ঋতুবর্ণনা ও সেই প্রসঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর প্রতি কামীদের অনুরাগ, পাদতাড়িতকে গণিকাগৃহের বর্ণনা বাণভট্টের রচনাশৈলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে অধিকাংশ বর্ণনাই তুলনামূলকভাবে সহজ ভাষায় করা হয়েছে। ভাণের লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত প্রহসন ও ভাণে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে ও হাস্যপরিহাসের দ্বারা তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন স্খলন ও কামপ্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গালিগালাজ ও অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থাকলেও সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিকে ব্যঙ্গ

করার ও তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার সুযোগ লেখকগণ কোথাও হাতছাড়া করেন নি। প্রাচীন ভাণের ভাষারীতির এই সাবলীলতা অবশ্য উত্তরকালীন ভাণগুলিতে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার সাবলীল গতিকে রুদ্ধ করেছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে দুতিনলাইনব্যাপী সমস্ত পদও লক্ষ্য করা যায়। ভাণের নায়ক বিট আকাশভাষিতের মাধ্যমে মূলতঃ শৃঙ্গাররসের ও হাস্যরসের সাহায্যে বর্ণনীয় বিষয়কে উপস্থাপিত করে। এই রচনাশৈলীর তুলনা অন্যত্র দেখা যায় না।

প্রথম অধ্যায়ে আচার্য ভামহ, আচার্য মম্মট, আচার্য বিশ্বনাথ, আচার্য ধনঞ্জয়, আচার্য রাজশেখর প্রমুখ কাব্য ও নাট্যতত্ত্ববিদদের গ্রন্থে কাব্য বলতে কি বলা হয়েছে তার আলোচনা করে সকলের বক্তব্যের নির্যাসটুকু নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলায় আমরা সাধারণভাবে নাটক বলতে যা বুঝি সংস্কৃতে তাকে রূপক বলা হয়েছে। এই রূপকগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে দশটি প্রকারভেদ স্বীকার করা হয়েছে। এই দশরূপকের অন্যতম ভাণ। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাণের স্থান কোথায় এবং নাটিকাদির তুল্য মর্যাদা না পেলেও সমাজচেতনা গড়ে তোলায় ভাণের ভূমিকার জন্য তারও যে একটি মর্যাদার আসন থাকা উচিত — এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যতত্ত্ববিদদের মতে ভাণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে চতুর্ভাণীর অন্তর্গত ভাণগুলিতে সেগুলি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে। ভাণের একমাত্র পাত্র বিট কিভাবে আকাশভাষিতের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের অভিনয় করে ও ভাণের বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভাণে মুখ ও নির্বহণ সন্ধির প্রয়োগ, কৈশিকী বৃত্তির ব্যবহার থাকবে কি থাকবে না, বিভিন্ন লাস্যাঙ্গের প্রয়োগ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভাণের রসপ্রয়োগের দিকটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যতাত্ত্বিকদের মতে ভাণে শৃঙ্গার বা বীররসের প্রাধান্য থাকবে। আমাদের গবেষণানিবন্ধে দেখানো হয়েছে ভাণগুলিতে শৃঙ্গাররসেরই প্রাধান্য, তারপরই হাস্যরসের স্থান। আশ্চর্যের বিষয় ভাণে হাস্যরসের ভূমিকাটি নাট্যতত্ত্ববিদদের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। বীররস ও করুণরসের প্রয়োগও কোন কোন ভাণে লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুর্ভাণীর অন্তর্গত চারটি ভাণের আলোচনা আছে। এখানে

লেখক পরিচিতি, লেখকের ব্যক্তিত্ব, রচনাকাল ইত্যাদি প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর চারটি অধ্যায়ে চারটি ভাণের কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে বলার পর প্রধান প্রধান পুরুষচরিত্র ও নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। চারটি অধ্যায়ে চারটি ভাণের রস ও ভাবের প্রয়োগ বিভিন্ন ধরণের ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও অলংকার ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা বা বিভিন্ন চরিত্র্যের বৈশিষ্ট্য কীভাবে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে — সেই দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ভাণসাহিত্যের সমাজ ব্যবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচিত হয়েছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। যে কোন সাহিত্যকারের রচনাতেই সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রভাব পড়ে। সেই কাব্য বা নাট্যরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সমাজের চিত্র ভাণসাহিত্যে ধরা পড়েছে। এখানে রাজারাজড়ার চিত্র অপেক্ষা সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকজনের জীবনযাত্রা, কথাবার্তার ধরন প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। তৎকালীন নর্মজগতের পরিচিতি এখানে বিধৃত হয়েছে। চতুর্ভাণীতে তৎকালীন ভূগোল, নগরব্যবস্থা, বেশভূষা, ধর্ম, সঙ্গীতচর্চা ও দেশীয় জীবনধারার পরিচয় মেলে। জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা গুপ্ত সংস্কৃতির জীবন্ত পরিচয় বহন করে।

ধর্মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেশ্যাগমন গুপ্তযুগে কোন অন্যায় কাজ হিসেবে নিন্দিত ছিল না, বেশ্যাগমন ছাড়াও মদ্যপান ও জুয়াখেলার চল ছিল। পানশালার বর্ণনাও পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও উপবনযাত্রার বিবরণ আছে।

বীণার সঙ্গে গানের প্রচলন ছিল। পদ্মপ্রাভৃতকে শোণদাসীর মন্দমধুর স্বরে বল্লকীর ছড় টেনে কৈশিক রাগে গান করার কথা বলা হয়েছে। পাদতাড়িতকে সপ্ততন্ত্রী বীণায় কাকলী পঞ্চমস্বরে গানের কথা আছে। বল্লভা নামক চতুষ্পদী গান ও উভয়াভিসারিকাতে বক্ত্র ছন্দে গানের উল্লেখ আছে। গানের সঙ্গে মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, বাঁশরী বাজানোর রেওয়াজ ছিল। বিপঞ্চী ও তন্ত্রী যন্ত্রের উল্লেখ আছে। বীণাচার্য রূপে গান্ধর্বমেনক ও ভাব গন্ধর্বদত্ত নামে নাটকাচার্যের উল্লেখ আছে। নাটকাচার্যের শিষ্যের কথাও জানা যায়।

ভাণসাহিত্যে তৎকালীন বেশভূষার পরিচয়ও পাওয়া যায়। পেলবাংশুক বা মলমল (ধূর্তবিটসংবাদ), রক্তাংশুক (পাদতাড়িতক), শাটিকা বা শাড়ি (ধূর্তবিটসংবাদ) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। নারীরা চাদর (প্রাবার) ও দুকূলপট্টিকা পড়ত। ধূর্তবিটসংবাদে পুরুষের অধোরুকের কথা পাওয়া যায়। অমরকোষে অধোরুক নারী ও পুরুষ উভয়ের পোশাক রূপে

বর্ণিত হয়েছে। পাতলা অংশুকের ঘোমটার মধ্য দিয়ে নারীমুখ দেখা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (পাদতাড়িতক)। কটিবস্ত্র নীবী অথবা দশান্তনীবীর কথা পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই উত্তরীয় পরিধানের রেওয়াজ ছিল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে উত্তরীয় খসে পড়ার কথা পাওয়া যায়। অলংকাররূপে কর্ণপুর (পদ্মপ্রাভৃতক/পাদতাড়িতক), পুষ্পাপীড় (পদ্মপ্রাভৃতক), কর্ণোৎপল (ধূর্তবিটসংবাদ; পাদতাড়িতক), কর্ণপাশ, কুণ্ডল (পা.তা.) সোনার তালপত্র (পা.তা.) প্রভৃতি কর্ণভূষণের কথা পাওয়া যায়। সাদা কাঠের কর্ণিকার কথাও পাওয়া যায়। অন্যান্য অলংকারের মধ্যে হাতের গয়না বলয় (প. প্রা.), সিতকলস (পা.তা.), গলার হার (পা.তা.), সোনার বেকক্ষ্য (পা.তা.), মেখলা (প.প্রা. /উভ/পা.তা.), কাঞ্চী (ধূ.বি.), রশনা (পা.তা.) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা মণিমুক্তা ও সোনার সুতোয় বাঁধা তার বেণীতে ঝোলাত। পুষ্পবীথীতে কমল, কলি, উৎপল, রক্তাশোক প্রভৃতি ফুলের অলংকার, ফুলের মালা, আপীড় প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। রসরাজিকার কেশে বাসন্তী, কুমুদ আর কুরুবক পুষ্পের বর্ণনা করা হয়েছে। বেণীতে অশোক, স্তনে সিন্দুবার, আমের মঞ্জরীর কর্ণপুর (পদ্মপ্রাভৃতক) প্রভৃতি পুষ্পব্যবহারের কথাও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া প্রসাধনরূপে পত্রলেখা, বিশেষক, তিলক, অঙ্গরাগ, পায়ে আলতা ও বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়।

ভাণে দেখা যায় গণিকাপল্লীর সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিটরা জড়িত থাকত। বিট গণিকাপ্রেমী, বাক্‌পটু এবং মিত্রের উপকার করতে আত্মনিয়োজিত। ভাণগুলিতে বিটের চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত। বিট বিবাহিত কিন্তু নিজের সংসারে তার আসক্তি নেই। বুড়ো বিট পুনর্যৌবন লাভের জন্য রসায়নে আসক্ত হয়। কোথাও বিট অত্যন্ত দরিদ্র, কোথাও বা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। পাদতাড়িতকে বিস্তৃতভাবে বিটের জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিটমণ্ডপ ও ধূর্তগোষ্ঠীতে বিটের অত্যন্ত সমাদর। ঐশ্বর্যশালী বিট ভট্টিজীমূতের বিশাল বাড়ির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বহু লোকসমাগম। পরিচারকেরা রুপোর কলসী থেকে জল ঢেলে তাদের পা ধুইয়ে দিচ্ছে। পাঁচরঙা ফুলের পাপড়ি উড়ছে, ঘরগুলি ফুলে-মালায় সজ্জিত, দীপধূপধুনোর ছড়াছড়ি, নানা রঙের চূর্ণ-বিলেপন উড়ছে এবং মাখা হচ্ছে। সেখানে উপস্থিত গণিকাদের সঙ্গে বহু লোক ঠাট্টা-তামাশা করছে।

পাদতাড়িতকের বিট সারাদিন ব্যবহারজীবীদের সঙ্গে ঝগড়া করে সন্ধ্যেয় কোন বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে। তারপর রাতে গণিকাগৃহে যায় অথবা ছোরাছুরি নিয়ে মারামারি করে। প্রাণ দিয়েও বন্ধুকে রক্ষার চেষ্টা করে।

সংস্কৃত রূপকে বিভিন্ন ধরণের বিটের দেখা পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সবদিকগুলি তুলে ধরা হয় নি। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে — বিট বেশ্যোপচারকুশল, মধুর, দক্ষিণ, কবি, ঊহাপোহতে নিপুণ, বাগ্মী এবং চতুর। শৃঙ্গার-তিলক ও দশরূপকে তাকে একবিদ্য বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে (৩/৪১) বলা হয়েছে বিট অর্থাভাবে ফূর্তি করতে পারে না। সে ধূর্ত, বেশ্যোপচারে কুশল, বাগ্মী এবং গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠাযুক্ত। এই বর্ণনায় বিট সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কামসূত্রে বিট সম্পর্কে বলা হয়েছে — ভুক্তবিভবস্তু গুণবান্ সকলত্রো বেশে গোষ্ঠ্যাং চ বহুমতস্তদুপজীবী চ বিটঃ। পীঠমর্দ ও বিদূষকের সঙ্গে সে বেশ্যা ও নাগরকের সন্ধিবিগ্রহ স্থাপনের কাজ করত (১-৪-৪৭)। নায়কের দূতের কাজও করত (১-৫-৩৭)। নায়ক বিটকে পাঠিয়ে নায়িকার মান ভাঙাত এবং তাকে ঘরে আনত (২-৩০-৪৮)।

পদ্মপ্রাভৃতক ভাণে পীঠমর্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কামসূত্রে (১-৪-৪৪) পীঠমর্দের লক্ষণ করা হয়েছে — অবিভবস্তু শরীরমাত্রঃ মল্লিকাকেনকযায়মাত্রাপরিচ্ছদঃ পূজ্যাদ্দেশাদাগতঃ কলাসু বিচক্ষণঃ তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতে চ বৃত্তে সাধয়েদাত্মানমিতি। পাদতাড়িতকে একবার মাত্র চেটের উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে (৩৪/৫৮) চেট কলহপ্রিয়, বক্রবাদী, বিরূপ, গন্ধসেবী, মান্য ও অমান্য বিষয়ে বিজ্ঞ। নাটকসমূহে চেট নিম্নস্তরের পরিচারক। মৃচ্ছকটিকে চেটের হীনবৃত্তির পরিচয় আছে।

বিট ছাড়াও পাদতাড়িতকে ডিংডিকের উল্লেখ আছে। ধূর্তগোষ্ঠীর নর্মকলাবিদদের সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বিট লাট দেশের ডিণ্ডিককে পিশাচের সঙ্গে তুলনা করেছে। মনে হয় ডিণ্ডিক চিত্রকলায় পটু ছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে বসুদেব হিণ্ডীছাড়া অন্য কোথাও ডিণ্ডিকের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পূর্বেই বলা হয়েছে ভাণসাহিত্যে গণিকাদের বিষয়েই বেশি আলোকপাত করা হয়েছে। বেশ্যার বিভিন্ন নাম ছিল -— পুংশ্চলী, কামিনী, বন্ধকী, বেশযুবতি, গণিকা, বেশ্যা, বারমুখ্যা, বেশবধূ, গণিকাপরিচায়িকা, গণিকাদারিকা, বেশ্যাঙ্গনা-পরিচারিকা, বিলাসিনী, বেশযুবতী, বরযুবতী, বেশ্যাজন, বেশ্যাবধূ মদনদূতী, শম্ভলী, প্রেষ্যযুবতী, বেশলক্ষ্মী, বেশস্ত্রী, চেটিকা, বেশদেবতা, অঙ্গনা, বৃষলী, পাত্রী, নটী, চামরগ্রাহিণী, বেশকন্যকা, পতাকাবেশ্যা, রূপদাসী, রূপাজীবা, বেশসুন্দরী, দাসী, বারস্ত্রী, কুট্টিনী।

চতুর্ভাণী থেকে এই নামগুলির মধ্যে পার্থক্য সম্পষ্ট হয় না, কিন্তু সাহিত্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্ভাণীতে গণিকাজীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে ঠিকমতো হৃদয়াঙ্গম করতে হলে কামসূত্র, নাট্যশাস্ত্র, মৃচ্ছকটিক ইত্যাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন প্রয়োজন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকে গণিকাপল্লীতে যাতায়াত করত। ভাণসাহিত্যে তাদের নাম পাওয়া যায়। যেমন, শারদ্বতীপুত্র সারস্বতভদ্র, শৈব্য আর্যরক্ষিত, দাক্ষিণাত্য আর্যরক্ষিত, গুপ্ত ও মহেশ্বরদত্ত, দাশেরক রুদ্রবর্মা, কবি দত্তকলশি বৈয়াকরণ, ধর্মাসনিকপুত্র পবিত্রক, ন্যায়াধীশ বিষ্ণুশর্মা (বৈষ্ণব), সন্ধিলক (পতিত বৌদ্ধ ভিক্ষু), বিলাসকৌণ্ডিনী (পরিব্রাজিকা), কৃষ্ণিলক, কুবেরদত্ত, সমুদ্রদত্ত, ধনমিত্র শেঠ, মৌর্য চন্দ্রোদয়, কুমার ময়ূরদত্ত, প্রথম অপরান্তাধিপতি ইন্দ্রবর্মা, আনন্দপুরের কুমারমঘবর্মা, রাজার শ্যালক রামসেন ও মরুকুমার, মহামাত্রপুত্র নাগদত্ত, মহামাত্রপুত্র শাসনাধিকৃত বিষ্ণুনাগ, অমাত্য বিষ্ণুদাস, মহাতলবর হরিশূদ্র, ইভ্যপুত্র বিট প্রবাল, ভিষক্ হরিশ্চন্দ্র, চিত্রকর নিরপেক্ষ এবং ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ পুস্তক বাচক। এছাড়াও সেখানে বিট, পীঠমর্দ, চেট, নৃত্যশিক্ষক প্রমুখের যাতায়াত ছিল।

ভরতের দৃষ্টিতে গণিকার পদমর্যাদা যথেষ্ট উঁচুতে ছিল। তার মধ্যে লীলা, হাব-ভাব, সত্য, বিস্ময় এবং মাধুর্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। ৬৪ কলায় তাকে শিক্ষিত করা হত। রাজোপচারে কুশলতা এবং স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক দোষও তার ছিল। সে মৃদুভাষিণী, চতুর এবং পরিশ্রমী হত (২৫/৬০-৬২)।

কামসূত্র ও চতুর্ভাণী থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে কোন কোন বেশ্যার প্রেম ব্যবসায়িক না হয়ে নিকষিত হেম ছিল। কামসূত্রে (১/৩/২০-২১) বেশ্যার জীবনের কলাগুণের মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে অম্বাপালীর কাহিনী বহুখ্যাত।

বেশ্যাদের সঙ্গে নাগরকদের সম্বন্ধ থাকত। তারা একসঙ্গে আপানকে যেত, উদ্যানক্রীড়া ও গোষ্ঠীতে সম্মিলিত হত।

বেশ্যার জীবন, বসন্তসেনার মত উদার ও গুণবতী নটী, তাদের পণবন্ধ দাসীর টাকা দিয়ে মুক্তিলাভ ইত্যাদি মৃচ্ছকটিকে পাওয়া গেছে। দশকুমারচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। পাদতাড়িতকে বিভিন্ন দেশের বেশ্যার এমনকি যবনী বেশ্যার কথাও বলা হয়েছে।

ভাণসাহিত্যের বিষয় বেশিক জীবন হলেও প্রসঙ্গক্রমে গুপ্তযুগের ধর্মবিশ্বাসের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। গুপ্তযুগে ভাগবত ধর্মের প্রভাব ছিল। চর্তুভাণীও ভাগবতধর্মের প্রভাবকে সমর্থন করে।

এ বিষয়ে প্রথমেই চৌক্ষ শব্দটি বিচার্য। পদ্মপ্রাভৃতকে ধর্মাসনিকের পুত্র পবিত্রককে বিট চৌক্ষ বলেছে। পাদতাড়িতকে অমাত্য বিষ্ণুদাসকে চৌক্ষ বলা হয়েছে। পাণিনি (৪/৪/৬২) অনুসারে চৌক্ষ শব্দের সাধারণ অর্থ পবিত্রতা কিন্তু ভাণে চৌক্ষ শব্দটি লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত। চৌক্ষ-একায়ন ভাগবত। নাট্যশাস্ত্র ১৭/৩৮ বা ১৮/৩৪ শ্লোকে বলেছে চৌক্ষ বা চোক্ষ (অপপাঠ চৈক্ষ), পরিব্রাজক, মুনি শাক্য, শ্রোত্রিয়, শিষ্ট এবং ধার্মিক ব্যক্তি অবশ্যই সংস্কৃত বলবেন। চৌক্ষ শব্দের টীকা করতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত বলেছেন — চৌক্ষা ভাগবতবিশেষা যে একায়না প্রসিদ্ধাঃ। মনে হয় স্বস্তিবাচন, বন্দনা, যোগশাস্ত্র একায়ন ভাগবতধর্মের লক্ষণ ছিল। এছাড়া ভাগবত ধর্মের প্রমাণ — উভয়াভিসারিকাতে বলা হয়েছে পাটলিপুত্র ভগবান নারায়ণের মন্দিরলেখানে মদনসেনা মদনারাধনা সংগীতক দেখিয়েছিল। পদ্মপ্রাভৃতকে কামদেবায়তন, প্রদ্যুম্নদেবায়তন, কামদেব ও প্রদ্যুম্নের পূজা পঞ্চরাত্র ভাগবত ধর্মের ইঙ্গিতবাহী।

ভাণসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের চর্চার কথাও বলা হয়েছে। ভাণের রচয়িতাগণ বৌদ্ধদের প্রতি, বিশেষত ভিক্ষু হয়েও তার আচরণবিধি যারা পালন করতে পারেননি তাদের প্রতি ব্যঙ্গের হাসি হেসেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁরা কোন অশ্রদ্ধা পোষণ করেন নি। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী ও কাথিয়াবাড়ের বলভী অঞ্চলে বৌদ্ধদের বিশেষ প্রভাব ছিল। পাদ্মপ্রাভৃতকে বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ পিণ্ডপাত, বুদ্ধবচন, সর্বজীবে দয়া, তৃষ্ণাচ্ছেন, পরিণির্বাণ, অকালভোজন, পঞ্চশিক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। বিট অবশ্য প্রতিটি শব্দকেই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। পদ্মপ্রভৃতকে শাক্য ভিক্ষুণীর শৈষিলকের সঙ্গে ঘর বাঁধার কথা আছে। পাদতাড়িতকে বিট বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন তাতে বজ্রযান পন্থার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের পারিভাষিক শব্দ সংসার ধর্ম, তথাগত, শাসন ইত্যাদিকে বিট অন্য শ্লেষাত্মক অর্থে ব্যবহার করেছে। বৈশেষিক দর্শনের ষড়্পদার্থের প্রতিও পরিব্রাজিকা বিলাসকৌণ্ডিনী এবং বিট ইঙ্গিত করেছে। মথুরা ও বলভী শ্বেতাম্বর জৈনদের মুখ্য কেন্দ্র ছিল। বঙ্গদেশে পুণ্ড্রবর্ধন দিগম্বর জৈন্যদের কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণভারতে কর্ণাটক ও মহীশূর অঞ্চল দিগম্বর সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।